হয় যা পৃথিবীতে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র দেশে দেশে ছড়িয়ে দেয়। প্রকৃত অর্থে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। প্যাসিফিস্টরা যেখানে পৃথিবীর কিছু ভালো ভালো লোকের যুদ্ধবিরোধী বিবৃতি ও প্রচারের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়, সেখানে এঁদের মত ঠিক উল্টো। লেনিন বললেন, এটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো পৃথিবীর বাজার ও উপনিবেশগুলি লুঠ-দখল ও ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য মাঝে মাঝেই এই ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যতদিন এর মূল কারণ পুঁজিবাদের উৎখাত না হয়। রাশিয়া যুদ্ধরত দেশগুলির কাছে সন্ধি চুক্তি ও শান্তির প্রস্তাব পাঠালেও লেনিন বারবার সতর্ক করেছেন যে, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ব্যতীত এই যুদ্ধের শেষ নেই।

বিশ্ব যুদ্ধের দ্বিতীয় ঘটনা রাষ্ট্রসংঘ (League of Nations)-এর প্রতিষ্ঠা। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'Glimpses of World History' গ্রন্থে লিখেছেন—

'There can be no doubt that the league has been a tool in the hands of the great powers and especially of England and France'...

Fine words and phrases were used the imperialist powers were 'trustees' for the inhabitants of the mandated territories, and the league was to see that the conditions of the trust were fulfilled. As a matter of fact this made matters worse. The powers did just what they liked, but they put on a more Sanctimonious garb, and thus lulled the conscience of the unwary'...

Thus the great powers dominted the league, and they used it whenever it served their purpose to do so, and ignored it when this was found more convenient..."

যুদ্ধের তৃতীয় অবদান—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি এমনকি ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে তার বিস্তার। ভারতবর্ষেও দেশি-বিদেশি শিল্পপতিরা তাদের শিল্পগুলিকে প্রসারিত করতে লাগল। ভারতবর্ষে সমাজ অর্থনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় শিল্পপতি এবং বুদ্ধিজীবীরা এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হয়ে উঠেছিল।

মহাযুদ্ধের চতুর্থ উৎসার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলন—(Self determination of Nations and Colonial Liberation Movement)। বলশেভিকরা ক্ষমতায় এসেই পূর্বঘোষণা মতো জার শাসিত সমস্ত পরাধীন জাতি ও উপনিবেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিল এবং তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। মিত্র শক্তির প্রধানেরাও নীতিগতভাবে এটাকে সমর্থন করলেন। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া, ইরাক সহ সারা পৃথিবীতে এই আন্দোলন বিরাট আকার নিতে শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইউরোপ দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি ও আদর্শের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ—প্রতিক্রিয়া ও প্রগতি 'কণ্ঠ আকড়ি রয়েছে পাকড়ি দুই জনা দুই জনে।' পরস্পরকে নির্মূল করতে উদ্যত হল।

এই রকম একটি অবস্থায় দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। ওদিকে রমাঁরলাঁ, অঁরি বারবুস প্রমুখ বিবেকী চিন্তানায়কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ভাবধারার জগতের বুদ্ধিজীবীরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করলেন। বুর্জোয়ারা প্রমাদ গনল। চারিদিকে বামপন্থার প্রতি ঝোঁক। এই ঝোঁককে বামপন্থা দিয়েই কাটাতে হবে। তাই চাই নরম গরম স্লোগান। বামপন্থী দোদুল্যমান অংশকে ব্যবহার করে তাদের মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলানো এবং সেই সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের পথ থেকে শ্রেণী সমঝোতার পথে চালিত করার যে চক্রান্ত বুর্জোয়ারা করেছিল, তা থেকেই জন্ম নিল, শ্রমিক শ্রেণী বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদ। পুঁজিবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের মিলিত গর্ভযন্ত্রণা থেকেই জন্ম নিল ফ্যাসিবাদ।

এই ফ্যাসিবাদ আসলে কোনো নতুন মতবাদ নয়। সরোজমোহন মিত্রের ভাষায় "জাতি দম্ভী স্লোগানের সঙ্গে মেকী বিপ্লবী স্লোগান মিশিয়ে প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে এটা একটা নেতিবাচক আন্দোলন রূপে গড়ে উঠেছিল। হিংসাত্মক এবং আইন বহির্ভূত পদ্ধতি ব্যবহার করাই এর বৈশিষ্ট্য। কমিউনিস্ট এবং ইহুদী বিদ্বেষই এদের প্রধান হাতিয়ার। এটা পুঁজিবাদের শ্রেণী কর্তৃত্বের একটি রাষ্ট্রীয় রূপ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় অন্য এক রাষ্ট্রীয় রূপের প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা।" ..."এদের প্রধান ভয় বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিকে। তাই জার্মানিতে বইয়ের বহ্নুৎসব হয়। থিয়েটার হলের হয় ভাঙচুর। লেখক, নাট্যকারদের বাড়িতে চলে হামলা। দেশ ছাড়া হতে হয় লেখক শিল্পীদের।" এই শক্তিরই নগ্ন প্রকাশ ঘটে ইতালির আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) আক্রমণে জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলে এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে।

এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সেটা পর্যালোচনা করার আগে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তা নায়কদের ধ্যান-ধারণা একটু জেনে নেওয়া ভালো। তিলক-বেসান্ত-গান্ধীর নেতৃত্বে বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ ইংরেজকে সাহায্য করেছে। সকলেরই আশা ছিল যুদ্ধের পর ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে। তাদের প্রতিশ্রুতির ভণ্ডামি ১৯১৮ সালে মন্টেগুর ভারত শাসন পরিকল্পনার মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অপরদিকে তুরস্কের সুলতান তথা ইসলামের খলিফার সংকট নিয়ে—ভারতবর্ষের শুরু হল খিলাফৎ আন্দোলন। পরাধীনতার বেদনা, উগ্রধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি একই সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করলেন এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল না। সারা পৃথিবীর সমস্যাবলীর সঙ্গে যে আমাদের দেশের সমস্যাও গিঁট পাকিয়ে রয়েছে গান্ধীর দৃষ্টিও বোধহয় ততটা দেখার মতো পরিস্থিতিতে ছিল না। ১৯১৮ (ডিসেম্বর) দিল্লি কংগ্রেস মদনমোহন মালব্য তাঁর সভাপতির ভাষণে প্রথমেই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ব্রিটিশ সম্রাটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এমনকি ভার্সাই সন্ধির পরেও গান্ধীজীসহ কোনো নেতাই মহাযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্য অনুতপ্ত হননি।

একদিকে যুদ্ধের হিংস্র তাণ্ডব লীলায় রবীন্দ্র-হৃদয় ক্ষতবিক্ষত অপরদিকে ভারতের ভিতরের রাজনীতিতেও গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য; একদিকে বিশ্বমানবতা অপরদিকে জাতীয়তা—এ দুয়ের মিলন সাধনা। এরই ফলশ্রুতি—'বিশ্বভারতী' (১৯১৮-এর ডিসেম্বরের শেষভাগে যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়)।

এবার দেখা যাক, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষে কীভাবে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে। চল্লিশের দশকে জাপানিরা বোমা ফেলার আগে পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের বিপদ এদেশে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহলে তিরিশের দশকেই এই সম্পর্কে ধারণা তৈরি হতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার ভ্রান্ত ধারণায় পুষ্ট ছিলেন।

এখানে ১৯২৬-এ যখন রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বারের জন্য ইতালি গেলেন তখনও পর্যন্ত ফ্যাসিজমের বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না (?), সেখানে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার ইতালি যাত্রা এবং মুসোলিনীর প্রতি তাঁর দুর্বলতা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। এটুকু বলা যেতে পারে, মুসোলিনী তার দুর্বলতম জায়গা বিশ্বভারতীকে সাহায্য করেছেন। ফলে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে থাকতেও পারেন। তাছাড়া তিনি ইংরেজি পত্র-পত্রিকার খবরের প্রতিও বিরূপ ছিলেন। পরে রমাঁ রলাঁর সতর্কবাণীতে বিশেষ করে ভুক্তভোগীদের জবানবন্দীতে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং নিজেকে সংশোধন করেছিলেন। তিনিই বলতে গেলে প্রথম ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে ১৯২৬-এর ৫ই আগস্ট সি এফ এন্ড্রুসকে এক চিঠি দেন। সেটা ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৯ সালেই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ হিসাবে সামনে নিয়ে এলো—ফ্যাসিবাদকে রোখা এবং যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা। এই কাজে সাংস্কৃতিক কর্মীদের গুরুত্ব দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কৃতি চিন্তা এবং শ্রমিক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ফেডারেশনের কাজ নামে একটি নীতিগত পরিকল্পনা প্রকাশ করে বলে—সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজ হবে—"সমস্ত পচনশীল ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী মনোভাবের সক্রিয় বিরোধিতা।"

১৯৩২-এর ১০ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সাহিত্যিক সংঘের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়—"আমরা পৃথিবীর সমস্ত কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক ও লেখকদের আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেন তাঁদের প্রতিভার ক্ষুরধার অস্ত্র নিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত সংগ্রামী মানুষকে রক্তাক্ত অত্যাচার থেকে রক্ষায় সচেষ্ট হন।"

১৯৩৩-এর শুরুতেই হিটলারের নাৎসি পার্টি জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করে। এ সময়ে জওহরলাল নেহেরু ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন—'ফ্যাসিবাদ ইতালির কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়। এটা অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। যখনি কোনো দেশের শ্রমিকরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে বিপদ হয়ে দেখা দেয় এবং যখন শাসক গোষ্ঠী পুলিশ এবং সামরিক শক্তির সাহায্যে সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন তারা ফ্যাসিস্ত রাস্তা গ্রহণ করে। এরা

শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করে দেয় এবং অন্যান্য বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করে রাখে।' এ সময়েই সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁদের লেখনীতে হিটলারের মতবাদকে বিদ্ধ করেন।

১৯৩৫-এ ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে ২৬শে জুলাই অ্যালবার্ট হলে এক প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন জে সি গুপ্ত। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ১৯৩৮শে ১লা আগস্ট এখানেই কলিকাতার ছাত্ররা যুদ্ধবিরোধী দিবস পালন করে। ১৮৩৫-এ প্যারিসে ম্যাক্সিম গোর্কি, আন্দ্রেজিদ, ই এম ফস্টার, আন্দ্রে মার্লো প্রমুখের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতি রক্ষার যে সম্মেলন হয় তার থেকে লেখকদের একটি আন্তর্জাতিক সংঘ গড়ে ওঠে জুন মাসে। আর আগস্টে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের যে সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাতে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ফ্যাসিবিরোধী বামফ্রন্ট এবং ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়।

এদিকে ১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময়েই প্রেমচাঁদের নেতৃত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপরেই জুন মাসে লন্ডনে আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের যে দ্বিতীয় সম্মেলন হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, জওহরলাল প্রমুখ ভারতের প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষে স্বাক্ষর করে ফ্যাসিবাদের নিন্দা প্রস্তাব পাঠান। সেপ্টেম্বরে জেনিভায় বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য রমাঁ রলাঁ কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানালে কংগ্রেস তা গ্রহণ করে।

'ওয়ার্ল্ড কমিটি ফর স্ট্রাগল এগেনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওয়ার'-এর বিশ্ব কমিটির সভাপতি ছিলেন রমাঁ রলাঁ। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে এর ভারতীয় শাখা খোলা হয়। ১৯৩৬-এই ফ্যাসিস্তরা ষড়যন্ত্র করে স্পেনকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। সারা পৃথিবী উত্তাল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সাহিত্যিকরা বিচলিত হয়ে ওঠেন সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত লেখক কলম ছেড়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়—সে এক স্মরণীয় সময়।

এই যুদ্ধে র‍্যালফক্স, ক্রিস্টোফার কড়ওয়েল, জন কর্নফোর্ড মৃত্যুবরণ করেন। ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে জওহরলাল নেহরু স্পেনের রণাঙ্গণে গেছিলেন। স্পেনের আন্তর্জাতিক বিগ্রেডে ভারতীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি কমরেড গোপাল মুকুন্দ জুড্ডার। তিনি দেশে ফিরলে তাকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আক্রান্ত চীনেও 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল টিম' পাঠানো হয়। আমাদের দেশে চীন দিবস পালন করা হয়।

চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন, হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতিই গেল পালটে। চার্চিল, রুজভেল্ট, স্তালিন সম্মিলিতভাবে গঠন করলেন ফ্যাসিবিরোধী মহাজোট। হিটলার ও ফ্যাসিবাদকে চিরকালের জন্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সারা বিশ্বের কাছে তারা আবেদন জানালেন।

২০শে জুলাই কলকাতার প্রায় সব বুদ্ধিজীবী লেখক শিল্পীরা এক মিলিত আবেদনে বললেন—

"সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন

অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া আজ যন্ত্র ও মানুষের তাণ্ডব চলিতেছে; ব্যাপকতায় এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব। এই সংকট কালে আমরা মনে করি নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। ...কুড়ি বৎসরের প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না।"

পরদিন সোভিয়েত দিবসে—টাউন হলে শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট জনসভা হয় সেখানেই 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এর কয়েকদিন পরেই ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে সভাপতি এবং হীরেন মুখার্জি ও এস কে আচার্যকে যুগ্ম সম্পাদক করে 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘে'র প্রতিষ্ঠা হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ, তবু তিনি কথা দিয়েছিলেন সুস্থ হলেই তিনি এই সংঘের পৃষ্ঠপোষক হবেন। তাঁর সে আশা আর পূর্ণ হয়নি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে এর অনেকগুলি শাখাও গঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে আজও বিভিন্নরূপে পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদ তার পাখা যত বিস্তারিত করে চলেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তিও বেড়ে চলেছে।

এবারে আমরা দেখব, রবীন্দ্র-সাহিত্যে এর কি প্রকাশ ঘটেছে। 'কালান্তর' প্রবন্ধে এবং 'বাতায়নিকের পত্রে' আমরা এর বিস্তারিত উল্লেখ পাই এছাড়া বিভিন্ন পত্রে কবি প্রতিবাদ ও উল্লেখের দাবি রাখে। এখানে তাঁর কাব্যে এই বিরোধিতা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখব। ১৯৩৭-এ স্মরণ রাখা দরকার আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীন রণাঙ্গন সমস্ত জায়গা থেকেই পরাজয়ের খবর আসছে—১৫ ডিসেম্বর নানকিং-এর পতন, ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে কবি লেখেন দুটি কবিতা—

(১) "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

'যেদিন চৈতন্য মোর' কবিতায় ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান—

(২) "..... মহাকাল সিংহাসনে—
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধ কণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

সংবাদপত্রের একটি খবরে দেখা যায় যুদ্ধযাত্রার পূর্বে জাপানের এক দল সৈনিক

ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে যুদ্ধে জয় কামনা করেছে, তাদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে কবি লেখেন—'বুধং শারণং গচ্ছামী'

"যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোলো দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তুরি ভেরী গরগর শব্দে
কেঁপে উঠল পৃথিবী।
ধূপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে,
করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা—
কেননা ওরা যে জাগবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ করে;
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র
ধ্বজা তুলবে লুপ্তপল্লীর ভস্মস্তূপে
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
তাইতো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ।
বেজে উঠল তুরি ভেরী গরগর শব্দে
কেঁপে উঠল পৃথিবী।"

(—প্রবাসী, ১৩৪৪)

এর মধ্যেই কবির জন্মদিন এসে পড়ে; 'জন্মদিন' শীর্ষক কবিতায় লিখলেন—

"ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধ মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনারকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি,
শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি।"

আগস্ট সেপ্টেম্বর নাগাদ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কবি নেগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক পত্র বিতর্ক হয়। সকলেরই কমবেশি বিষয়টি জানা।

মিউনিখ চুক্তি ১৯৩৮ নিয়ে অমিয়বাবুকে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্তে মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দ্রংষ্টাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা

তার প্রাচ্যসাম্রাজ্যের নির্বিকারচিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হা কার মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লাভাকিয়াকে; দেখলুম নন-ইন্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে—দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছু হল না—পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হল দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলন্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজ্‌মের নাৎসিজ্‌মের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।”

এ বিষয়ে ‘আহ্বান’ (১৯৩৮) কবিতাটিও উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯৩৮-এর ৪ অক্টোবর ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতায় কবি চেকোশ্লাভাকিয়ার পাশে দাঁড়ালেন—

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।।
দুঃসহ তাপে গর্জি উঠল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিঃশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।।
প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।

মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে কবির জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।
ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
..... ভুলাইতে দেবতায়।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া,
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।
শুধু বাণীকৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা।
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া।
লবে বিধাতার ক্ষমা।।
সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।।

চারিদিকে মুক্তি ফৌজের পরাজয়ের খবর আসতে থাকে। মিত্রশক্তি টিকতে পারছে না।

ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যান্ড—অবশেষে মহাশক্তিধর ফ্রান্সেরও পতন ঘটল।

সারা বিশ্বে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে ও ত্রাসে কালযাপন করতে লাগল। ১৯৪০-এর ২০শে মে কবি লিখলেন ‘রক্তমাখা দন্তপংক্তি’—

“রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর-গ্রামের
অস্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে,
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হ’তে

রাজ্য সাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলো ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।"
(—'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ২১ সংখ্যক কবিতা)

এখানে রবীন্দ্র গবেষক নেপাল মজুমদারের লেখা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে—

"যুদ্ধের ঠিক এই সময়টাতে কবি যতখানি ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়েছিলেন, এমনটি বুঝি আর কখনও দেখা যায়নি। যেদিন ফ্রান্সের পতনের সংবাদ এল, (১৫ই জুন, ১৯৪০) সেই দিনই তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এক তারবার্তায় আমেরিকার হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানালেন। বস্তুত, সেটা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা বা যুদ্ধে আমেরিকাকে অবতীর্ণ হওয়ারই অনুরোধ। মনের প্রচণ্ড ক্রোধ ও উত্তেজনায় কয়েকদিন পর এই ফ্যাসিস্ত নর-পিশাচদের হিংস্র ও উন্মত্ত ধ্বংসলীলাকে প্রচণ্ড ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আক্রমণ করে অমিয়বাবুকে এক চিঠিতে (২০শে জুন, ১৯৪০) কবি লিখলেন :

'ডারুয়িন বলেছেন, বানরের অভিব্যক্তি মানুষ, কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তি এ কোন্ জানোয়ারে। প্রাণীজগতের আদি যুগে বর্মেচর্মে ভারাক্রান্ত, বিকট জন্তুরা আস্ফালন করে পৃথিবীকে দলিত করেছিল তারা তো প্রাণলোকের অসহ্য হয়ে উঠল, টিকতে পারল না। ...প্রাচীন ডাইনোসরদের সঞ্চরণ ক্ষেত্র আজকের দিনে যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে তার প্রেত উঠেছে জেগে, যে রাস্তা দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হয়েছে সেই রাস্তা দিচ্চে দেখিয়ে।'

স্মরণ করা দরকার, এই যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্ত-নরদানবদেরই মূর্তি দান করে কবি এই কালে অতিকায় এবং বিকটদর্শন সব প্রাগ্-ঐতিহাসিক জন্তু ও সরীসৃপের ছবি এঁকেছিলেন। কবি স্বয়ং মুসোলিনীর যে ব্যঙ্গ-চিত্র এঁকেছিলেন, সে ছবিও আজ প্রায় সকলেই দেখেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন হালকা চালে, কিন্তু গভীর ব্যাঙ্গের খোঁচা দৃষ্টি এড়ায় না।

(১) "জাপানেতে যুদ্ধের দামামা
বাজাইছে বুদ্ধের ভক্ত

কালীঘাটে রেগে বলে শ্যামা মা
আমি তবে কোথা পাব রক্ত।"

(২) "মিউনিখে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ যত্নেই
তারে আর কোনমতে ফেরাবার পথ নেই
বিড়াল ফেরার হল, নাই নাম গন্ধ
জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।"

(৩) "জাপানি ও জাপানি
তোমার হাড়ে লাগবে কাঁপানি
এখন যত কর লাফানি ঝাপানি।"

এমনকি ঘরোয়া আলোচনাতেও কবি হিটলার প্রসঙ্গ তুলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। যাইহোক হিটলার মুসলিনীদের প্রতি কবির শেষ কথা—

"রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত আখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।"

সভ্যতার সংকটে যে মহামানবের আহ্বান করেছেন, যে আশার বাণী শুনিয়েছেন সেটাই যেন কবির শেষ মুখ নিঃসৃত বাণী। তাই রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃত অংশটুকুই বোধহয় এ আলোচনার সার্থক উপসংহার হতে পারে—

"১৯৪১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ। কবি মৃত্যুশয্যায়। তবু উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার জানতে চাইছেন, প্রশান্ত মহলানবিশের কাছে—'কী পরিস্থিতি রণাঙ্গণের? প্রশান্ত মহলানবিশ জানান, 'এখানো এগিয়ে চলেছে দস্যু বাহিনী', কবি ডুবে যান নীরব বিষণ্ণতায়। ...অবশেষে শেষবারের মতো সংজ্ঞা এলো কবির। চোখে একই স্বপ্ন। কিন্তু প্রশান্ত মহলানবিশের উত্তর এবার ভিন্ন। 'সোভিয়েত বাহিনী প্রতিরোধ শুরু করেছে।' রবীন্দ্রনাথ উৎসাহে অধীর হয়ে ওঠেন, বলেন, 'পারবে, দানবকে ঠেকাতে ওরাই পারবে'।"

Anal Biswas, Panchmura Mahavidyalaly, Bnakura, West Bengal
anal.biswas1@gmail.com